Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 201 - 214
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 201 - 214
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লোকনাট্য : মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রেক্ষিতে

শুভঙ্কর রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ
Email ID: suvha1988roy@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Definition, Characteristics, Origin, Development, Geographical Location of Districts, Purpose, Differences, Importance of Folk Drama.

Abstract
Culture is the carrier and carrier of human civilization. Culture is the carrier and carrier of civilization. The individual characteristics of people living in the world are reflected through cultural activities. Although culture is the artistic form of human life, its form is different according to the country and environment. That is why we notice a huge difference between the culture of urban life and the culture of the illiterate working people in rural areas. The topic of my research paper is 'Lokanatya: Perspectives of Malda and South Dinajpur Districts'. The predominantly agricultural lifestyle of these districts has especially dominated the rural culture. Gambhira, a folk drama of West Bengal's Malda district, is one of the genres of Bengali folk culture. 'Gambheera' is a narrative song sung in groups. In Malda district area 'Gambhira-dance' is performed to the tune of 'Gambhira' song by wearing 'Gambhira' mask. The 'Gambhira' festival mainly centres around Shiva Puja. Another name of Shiva is 'Gambhira' hence Shiva's festival is 'Gambhira' festival and Shiva's bandana song is 'Gambhira song'. Based on the story of 'Gambhira', the drama written and acted orally is 'Gambhira folk drama'. 'Gambhira' folk drama is simultaneously visual, audio and acting. The folk drama of South Dinajpur is known as 'Khon'. The word 'Khan' is derived from the word 'Khand' which means event. In other words, an incident that happened in the folk society is 'excavated'. 'Khon' is a popular drama form of folk society of Dakshin Dinajpur district. In this research work, I have tried to highlight the definition, characteristics, origin, development, purpose, differences, and the discussion and features of 'Gambhira' and 'Khan' folk dramas in the cultural environment of the two districts.

Discussion

'গম্ভীরা' ও 'খন' বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। দুটিই মূলতঃ বর্ণনামূলক গান যা দলগতভাবে গাওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা অঞ্চলে 'গম্ভীরা'র মুখোশ পরে গম্ভীরা গানের তালে গম্ভীরা নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রের 'নানা-নাতি' খুব জনপ্রিয়। অনুমান করা হয় 'গম্ভীরা' উৎসবের প্রচলন হয়েছে শিবপূজাকে কেন্দ্র করে। শিবের এক নাম 'গম্ভীর', তাই শিবের উৎসব 'গম্ভীরা' উৎসব এবং শিবের বন্দনা গীতিই হল 'গম্ভীরা' গান। মালদহে মূলতঃ চৈত্র-সংক্রান্তির শিবপূজা উপলক্ষে বিগত বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী, নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে সমালোচিত হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট তামাশা, বড় তামাশা ও ফুলভাঙ্গা অনুষ্ঠানের গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হয়। 'গম্ভীরা' উৎসবের সঙ্গে এ সংগীতের ব্যবহারের পেছনে জাতিগত ও পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে। কথিত আছে প্রায় হাজার বছরের পুরনো গম্ভীরা উৎসব এবং তার ধারাবাহিকতা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার জীবনকে প্রভাবিত করে এসেছে। শুধুমাত্র মালদহ নয় আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবই 'গম্ভীরা' পূজা ও উৎসব নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতেও এটি 'গমীরা' নামে বিখ্যাত। চৈত্র মাসের শেষ চারদিনে মূল অনুষ্ঠান হয়। তবে অঞ্চলভেদে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এমন কি শ্রাবণ মাসেও শিবমূর্তি স্থাপন করে গম্ভীরা পূজা হয়। বর্তমানে মূলতঃ 'শিবপূজা' নামে খ্যাত হলেও প্রাচীনকালে এটি সূর্যের উৎসব ছিল বলে মনে করা হয়।

মালদহে এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে নিম্নবর্ণের হিন্দু, কোচ, রাজবংশী, পলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলতঃ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। 'গম্ভীরা' উৎসব মালদা জেলাতে প্রধানত চারদিনের উৎসব। প্রথমদিনে 'ঘটভরা' অনুষ্ঠান; গম্ভীরা মন্ডপে ঘটস্থাপন করে শিব পূজার উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে হয় 'ছোটতামাশা'; এই দিনে শিব-পার্বতীর পূজা হয়, পূজোর অনুষ্ঠান রং ,তামাশা ,আনন্দ রসিকতার মধ্যে কাটে এবং ঢাক-ঢোল বাদ্য সহযোগে মণ্ডপে নানা নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়দিনে 'বড়ো তামাশা'র' সন্ন্যাসীরা শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাচারে কাঁটা-ভাঙ্গা, ফুল-ভাঙ্গা ও বাণ ফোঁড়ায় অংশ নেয়। এই দিন মালদহে বিভিন্ন সঙের দল ঘোরে; রাতে গম্ভীরা মন্ডপে মুখোশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। চামুন্ডা, নরসিংহী, কালির মুখোশ পরে ঢাকের তালে তালে নৃত্য হয়। মুখোশ পরে উদ্দাম নৃত্যের মধ্যদিয়ে গম্ভীরার বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়। চতুর্থ দিনের উতসবের নাম 'আহারা'। এই দিন মন্ডপে শিবের সঙ্গে 'নীলপূজা'ও হয়, সঙ্গে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে। বিকেল বেলায় নানা প্রকারের সঙ বের হয়। বিভিন্ন সাজে সেজে এই সঙ গ্রাম-শহর পরিক্রমা করে। এই সঙ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম রীতিতে গান গেয়ে অভিনয় করা হয়। এইখানে সবরকম নাটকীয় গুণ প্রকাশ পায়। এই রীতিটাই হল 'গম্ভীরা লোকনাট্য'। আমরা এই দুই জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট,বিষয়গত পার্থক্য, আঙ্গিকগত পার্থক্য, উপস্থাপনগত পার্থক্য, শিল্পীদের অর্থনৈতিক উপার্জনগত আলোচনা এবং দুই জেলার সাংস্কৃতিক এবং অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লোকনাট্য 'গম্ভীরা' ও 'খন' আলোচনা করার চেষ্টা করব।

এক

ভারতের সংস্কৃতি প্রধানত আর্য-অনার্য মিলনের ফলশ্রুতি। আর্যরা বাংলাদেশে আসার আগে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তারপরে এসেছিল দ্রাবিড়। এই অস্ট্রিক, দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর পর বাংলাদেশে আর্যদের আগমন ঘটেছিল। বাংলাদেশের লোকসমাজের সমাজ ও সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভৃতি নানা জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। আমোদ প্রমোদের অঙ্গ হিসেবে সেদিনের মানুষের শিকার, চারণা, নৃত্য, গীত, অভিনয় লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। এরপর নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের লোকসমাজে লোকজীবনকে কেন্দ্র করে বৈচিত্র্যময় লোকনাট্যের সৃষ্টি হয়েছে। লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটককে সাধারণত 'লোকনাট্য' বলা হয়। 'লোকনাট্য' অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক এবং বাকুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন। লোকনাট্য একইসঙ্গে দৃশ্য, শ্রব্য এবং অভিনেয়। ছড়াতে যেমন কল্পনা আছে, ধাঁধাতে যেমন রহস্যময়তা আছে, প্রবাদে যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, লোকসঙ্গীতে রয়েছে আবেগ-উচ্ছ্বাস আর 'লোকনাটকে' ধরা পড়ে সমাজ জীবনের বাস্তব ছবি। তবে বর্তমানে ধীরে ধীরে লোকনাট্যের এই বিশেষ রূপটি বিলুপ্ত হতে

চলেছে। লোকনাট্য ধর্মনিরপেক্ষ হলেও লোকনাট্যের উদ্ভবের পিছনে ধর্মের ভূমিকা ছিল বিদ্যমান। মূলতঃ ধর্মীয় কোন ভাবনা থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটলেও ধীরে ধীরে বাতাবরণ মুক্তির দিকে এগিয়েছে এবং সম্পূর্ণ বাস্তব সামাজিক পূর্ণতার দিকে তার যাত্রা তরান্বিত করেছে। গ্রাম বাংলায় ব্যাপক পরিমাণে প্রচলিত যাত্রাপালাকে অনেকে 'লোকনাট্য' বলে অভিহিত করতে চান। যাত্রার মধ্যে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক যাত্রার উপস্থাপনা ও অভিনয়রীতি যেদিকে এগিয়েছে তার সঙ্গে লোকনাট্যের মঞ্চ অভিনয় কাহিনীগত ব্যবধান খুবই স্পষ্ট।

লোকসাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ সম্পদ লোকনাট্য। লোকনাট্য লোকসমাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত একটি সমবেত সৃষ্টি। এই সৃষ্টি প্রধানত মৌখিক। বছরের শুরু থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত অবসর সময়ে লোকশিল্পীদের দ্বারা লোকনাট্য সৃষ্টি হয়। তাই লোকনাট্য একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, সমগ্র লোকসমাজই এর স্রষ্ঠা। লোকনাট্যের মধ্যে নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি ব্যবহারিক কলা বিদ্যার প্রকাশ দেখা যায়। তাই লোকনাট্যের উদ্ভবে এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লোকসংস্কৃতিবিদ দুলাল চৌধুরী লিখেছেন-

> "বাংলার লোকনাট্য উদ্ভবের অন্তরালে গীত, পালা, গীতিকা, যাত্, পরব, সঙ্ এবং বিভিন্ন লৌকিক নৃত্য ও নৃত্ত, লোকউৎসব যাত্রা, পট, পুতুল ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি রেণুর প্রত্যক্ষ এবং যৌগিক প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[১]

লোকনাট্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য :

১. সংহত ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের মধ্যথেকে লোকনাটক জন্ম লাভ করে।

২. কাহিনীর মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত সংযোগ থাকে না। এক ধরনের কাহিনীগত শিথিলতা এর মধ্যে দেখা যায়।

৩. বলিষ্ঠ লোকপ্রিয় আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়।

৪. এই নাটকের বিষয়ভাবনা অনেক সময়ই পরিকল্পনাহীন।

৫. আঞ্চলিক উপভাষা এর প্রাণশক্তি।

৬. তত্ত্ববর্জিত এই নাটক অত্যন্ত সাবলীল ও রঙ্গমঞ্চের অকৃত্রিমতা।

৭. অভিনেতা ও দর্শক শ্রোতার মধ্যে স্থানগত ও রুচিগত ব্যবধান থাকে না। বর্তমানের পথ নাটিকার সঙ্গে এর অনেক মিল দেখা যায়। 'কথান্তর' এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একই কাহিনী নানা সময়ে নানা রূপ লাভ করে।

৮. সংগীত ও নৃত্য লোকনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লোকনাটক অনেক সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রচিত হয়। পরিবর্তনশীলতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. লোকনাটক গতিশীল ও বিবর্তনশীল। অধিকাংশ লোকনাটকে পুরুষচরিত্র সংখ্যায় বেশি থাকে। লোকনাটকের কাহিনী পুরাণ ও লোকসমাজ নির্ভর হয়ে থাকে।

১০. লোকনাট্য কাহিনীপুরাণ ও লোকসমাজ নির্ভর। প্রশ্নমূলক তথা ধাঁধার ব্যবহার লোকনাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। লোকনাটকের অনেকটা অংশই অভিনয় চলাকালীন রচনা অর্থাৎ তাৎক্ষণিক রচনা। লোকনাটকের চরিত্রগুলি সাধারনত একমাত্রিক হয়ে থাকে, জটিল চরিত্র লোকনাটকে বিরল। লোকনাটকে গদ্য ও পদ্য -দুই ধরনের সংলাপই ব্যবহৃত হয়।

লোকনাট্যের প্রকারভেদ :

বিভিন্ন প্রকার লোকনাট্যের পরিচয় আমরা খুঁজে পাই। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

খনের গান : উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলাতে এই শ্রেণীর লোকনাট্য অভিনীত হয়। 'খন' শব্দটি সংস্কৃত 'ক্ষণ' থেকে এসেছে। এ জাতীয় লোকনাট্য বা গান তাৎক্ষণিক রচিত বলে এর নাম খন বা খনের গান হয়েছে। সাধারণত নিরক্ষর গ্রাম্য পালা রচয়িতারা সারা বছর ধরে গ্রামের সামাজিক এবং পারিবারিক নানা ঘটনার উপর লক্ষ্য রাখেন। যদি সেই বছর কোন প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে গ্রামে কোন কেলেঙ্কারি প্রকাশ পায়, যেমন কুলত্যাগ, অসবর্ণ বিয়ে, গোপন প্রণয় ইত্যাদি তাহলে তারা সেই প্রসঙ্গগুলো ব্যবহার করে মুখে মুখে নাটক রচনা করে অভিনয় করেন।

পালাটিয়া : উত্তরবঙ্গের একশ্রেণীর গ্রামীণ লোকনাট্যের নাম ‘পালাটিয়া’। পালা শব্দের অর্থ লোকনাট্যের কাহিনী। এই শ্রেণীর লোকনাট্যের বিষয় বা কাহিনী খনের মত তাৎক্ষণিক রচিত হয় একটা গতানুগতিকভাবে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় এই জাতীয় লোকনাট্যের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। নাচ, গান ও ছড়া সংলাপের সমন্বয়ে পালাটিয়া তৈরি হয়। মূলতঃ রূপকথার কাহিনী কিংবদন্তিমূলক ও সামাজিক কাহিনী নিয়ে এই জাতীয় লোকনাট্য নির্মিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক সংলাপ এবং পল্লীগীতির সুরে এ পালার গান বাঁধা হয়। প্রধান গায়কের সঙ্গে কাহার ও বাদকগণ এ নাট্যে সহযোগিতা করে। এই শ্রেণীর লোকনাট্যে ‘মহান’ এবং ‘দেউলিয়া’ চরিত্র উপস্থাপিত হয়। নাচ, গান ও সংলাপ সহযোগে পূর্ণ পালায় পালাটিয়াতে অভিনীত হয়। এই পালাতে সাধারণত ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, অন্যায়ের শাস্তি, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেখানো হয়। তবে পালাটিয়া যদি নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয়, তাকে ‘মান পালাটিয়া’ বলে। আর প্রেমমূলককাহিনী নিয়ে রচিত হলে তাকে ‘নাস পালাটিয়া’ বলে।

লেটো : বীরভূম বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় প্রচলিত এক বিশেষ লোকনাটকে বলে ‘লেটো’। ‘লেটো’ মূলতঃ নৃত্য, গীত ও হাস্যরসাত্মক সংলাপ ভিত্তিক লোকনাট্য। এখানে গ্রাম জীবনের ছোটখাটো ঘটনা আঞ্চলিক সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকারে পরিবেশিত হয়।

রঙ পাঁচালী : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং জেলার কোন কোন অংশে অভিনীত একধরনের লোকনাট্য হল ‘রঙ পাঁচালী’। এই শ্রেণীর লোকনাটকে সাধারণত জীবনের লঘু দিকটিকে তুলে ধরা হয়। রঙ পাঁচালী আগাগোড়ায় হাস্যরসাত্মক। হাস্যরস দিয়েই যেমন রঙ পাঁচালীর সূচনা তেমনি হাস্যরসেই এর সমাপ্তি। আর তার অন্তরালে বাস্তবজীবন ভিত্তিক সুসংবদ্ধ একটি কাহিনী বর্তমান।

গম্ভীরা : মালদহ জেলার বিখ্যাত লোকনাট্য ‘গম্ভীরা’। গম্ভীরা সাধারণত শিব মাহাত্ম্যমূলক গান। এই গানের সঙ্গে নৃত্যেরও সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত লৌকিক সূর্য উৎসব বা শিবের গাজন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শিবের গাজন বা সূর্য উৎসবকে এই অঞ্চলে গম্ভীরা বলে। শুধুমাত্র মালদহে নয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও এই গম্ভীরা গানের প্রচলন দেখা যায়। এই গম্ভীরা উৎসব চৈত্র মাসে শুরু হয়ে বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের সমাজ জীবনে সারা বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি পর্যালোচনা।

আলকাপ : আলকাপ এর অপর নাম ‘আলকাটা কাপ’। আলকাপ শব্দটি সম্ভবত আরবি শব্দভাণ্ডার থেকে আগত। এর অর্থ সামাজিক রঙ্গ-ব্যঙ্গ। ‘আল’ বলতে তীক্ষ্ন বা ধারালো বোঝায়, ‘কাপ’ বলতে বোঝায় কপটতা বা রঙ্গ-ব্যঙ্গ। অর্থাৎ যে রঙ্গরসিকতার মধ্যদিয়ে কোন কিছুকে তীক্ষ্নব্যঙ্গ বিদ্ধ করা হয় বা ‘আল’ কাটা হয় যে কাপের মধ্যদিয়ে, তাকে ‘আলকাপ’ বলে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর ও বীরভূম জেলাতে আলকাপের প্রচলন রয়েছে। বীরভূম জেলাতে আলকাপ জাতীয় লোকনাট্য ‘ছ্যাচড়া’ নামে পরিচিত।

যাত্রা : লোকনাট্যের একটি অন্যতম ধারা ‘যাত্রা’। যাত্রায় বিশেষভাবে প্রাচীন লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। যাত্রার দর্শক পরিবৃত্ত সমতল আসর, যাত্রার অধিকারী, অভিনেতা ও তাদের অভিনয় পদ্ধতি, লোককর্মী বিষয়, গীতিভূমিকা ও যন্ত্রানুষঙ্গ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে লোকসাহিত্যের সঙ্গে যাত্রার গোত্র সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়।

গম্ভীরা গানের শুরুতে দেবাদিদেব শিবকে বন্দনা করার রেওয়াজ আছে। সেখানে শিবরুপী অভিনেতাকে মঞ্চে নিয়ে এসে তাঁকে সমস্ত বিষয় জানানো হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য কি করনীয় বা কোন সমস্যা থাকলে কিভাবে তার সমাধান করা যেতে পারে, তার প্রতিকারের নিদান দেন শিব। দর্শকের সামনে শিবকে উপস্থিত করে সমস্যার সমাধান করার মধ্যদিয়ে সমাজকে সচেতন করা হয়। সেখানে বুড়াবুড়ির নাচ, টাপা নাচ, সারস নাচ, মুখা নাচ, মশান নাচ, কালি নাচ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে সমাজকে সচেতন করা হয়। বাংলা গম্ভীরা সাধারণত দুই প্রকার, আদ্যের গম্ভীরা এবং পালা গম্ভীরা। প্রথমত - দেবদেবীকে সম্বোধন করে মানুষ যখন তার সুখ-দুঃখ পরিবেশন করে তখন তাকে আদ্যের গম্ভীরা বলা হবে। আর দ্বিতীয়ত - পালা গম্ভীরাই নানা-নাতির ভূমিকায় দুজন ব্যক্তির অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজের এক-একটা সমস্যা তুলে

ধরবে, আর মাঝে মাঝে গানের সুরে তা মানুষের অন্তরকে মজিয়ে তুলবে। দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের সংঘটিত নানা ঘটনা, সংগীত ও নৃত্যের মধ্যদিয়ে উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা করাই হচ্ছে গম্ভীরা গানের মূল উদ্দেশ্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, এমনকি সাম্প্রতিকতম নানা রাজনৈতিক হালচাল যা গম্ভীরা শিল্পের মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত হয়। এই উপস্থাপনা অবশ্যই উপভোগ্য হয়। এমনকি অনেক গম্ভীরায় বার্ষিক চাওয়া-পাওয়ার হিসাবও দেখতে পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে যা উপস্থাপন হয় তা মানুষের জীবনের কথা, মানুষের কষ্টের কথা, অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা। গম্ভীরাকে আরও বেশি মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে নৃত্যশিল্পীদের ছোঁ এর ঢঙে দেব-দেবীদের মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। এই গান সাধারণত পোলিয়া, রাজবংশী, নাগর, কোচ প্রভৃতি আদিবাসী শিল্পীদের কণ্ঠে বেশি শোনা যায়। উল্লিখিত অঞ্চলে নিম্নবর্গীয় হিন্দু, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাচের প্রচলন রয়েছে।

বাঙালি নিম্নবর্গের এই জনসংস্কৃতি যা প্রতিমুহূর্তে ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী স্বর হয়ে উঠতে চায়, তার শৈল্পিক প্রকাশ হিসেবে গম্ভীরা একটি অনবদ্য মাধ্যম। এই শিল্পে ব্যবহৃত গান, নাচ, অভিনয় সবই মানুষের হৃদয়ের অন্তস্থলে জায়গা করে নেয়। অনেক বিতর্কিত সত্য যা আপাত দৃষ্টিতে উস্কানিমূলক মনে হলেও মানুষের উপকারে আসে। সেই সকল কথা শ্রবণে তারা শিক্ষিত হয়, সচেতন হয়, অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিতও হয়। বিনোদনের পাশাপাশি সমগ্র জাতিকে এক সচেতনতামূলক বার্তা দান করে এই গম্ভীরা লোকনাট্য।

গম্ভীর আর ঐতিহাসিক সাবেকিয়া না কাটিয়ে সমসাময়িক জীবনের প্রত্যেকটি ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গম্ভীরা আজ অনেকাংশেই বদলে গিয়েছে। আধুনিকতার দিকে অনেকটাই এগিয়েছে বাংলার এই লোকশিল্প। গম্ভীরার গান, নাচ, স্ক্রিপ্ট সবই বাংলা থিয়েটারকে প্রভাবিত করেছে। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যাত্রা ও নাটকের ভাবধারাও কখনো কখনো গম্ভীরা লোকনাট্যকে প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তন শুধু লোকনাট্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত লোকসংস্কৃতির মধ্যেই এর প্রভাব পড়ে। সেই সূত্রে বিষয় ভাবনাতেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গম্ভীরার। স্মরণাতীতকাল থেকে গম্ভীরা মানুষের মন জয় করে আসছে। আশা করা যায় নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের হাত ধরে গম্ভীরা এগিয়ে যাবে আপন গতিতে তাদের শিল্পের ক্যারিসমায়। সেই কারণেই এই শিল্পকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এইখানেই সাধারণ মানুষের এই শিল্প রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা এসে যায়। যদি হারিয়ে যায় তা হবে আমাদেরই জন্য, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা বর্তমানে লোকসংস্কৃতির ঢাল ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অনেকেই এই শিল্পের প্রয়োগে যথেচ্ছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি যা অনেক সময় এই শিল্পের মাধুর্য বিনষ্ট করছে।

দুই

মালদহ জেলার উত্তরে বিহার ও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিনে মুর্শিদাবাদ, পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে ঝাড়খন্ড ও বিহারসহ জেলা। ৩৭৩৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থান। এটি বাংলাদেশের সাথে ১৫.৫ কিমি আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগ করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় অবস্থান হল এটি দক্ষিণবঙ্গ থেকে শিলিগুড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং প্রবেশের স্থান। মালদহের মানিকচকের কাছে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদী প্রথম প্রবেশ করে। নিচু অববাহিকা হওয়ায় এটি বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। মালদা জেলাটি ‘মালদহ’ বা ‘মলদা’ বা ‘মালাদো’ নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা যা কলকাতা থেকে ৩৪৭ কিমি উত্তরে অবস্থিত। আম, পাট এবং রেশম এই জেলার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পণ্য। এই অঞ্চলে উৎপাদিত বিশেষ জাতের আম ‘ফজলি’ জেলার নামে পরিচিত এবং বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। লোকজ সংস্কৃতি গম্ভীরা এই জেলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা সাধারন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ ও দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে উপস্থাপনার এক অনন্য মাধ্যম।

জেলা সদর হল ইংলিশ বাজার, এটি মালদা নামে পরিচিত যা একসময় বাংলার রাজধানী ছিল। জেলা সংস্কৃতি ও শিক্ষায় অতীতের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত এই শহরটি পুরাতন মালদা, ইংরেজি বাজার মহানগরের এক অংশ। পুরান রাজধানী পান্ডুয়ার নদীবন্দর হিসেবে এই শহরটি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি ছিল সমৃদ্ধ সুতি এবং রেশম শিল্পের আসন। ধান, পাট এবং গমের জন্য

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 201 - 214
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গুরুত্বপূর্ণ বিতরণ কেন্দ্র হিসেবেও বর্ণনা পাওয়া যায়। 'জামে মসজিদে'র ঐতিহাসিক 'স্মৃতিস্তম্ভ' এবং মহানন্দা নদীর ওপারে 'নিম সরাই' টাওয়ারের সুনির্দিষ্ট স্থানটি ১৮৬৭ সালে একটি পৌরসভা গঠন করেছিল। ধান, পাট, শিং এবং তেলবীজ আশেপাশের প্রধান ফসল। মালদা ভারতের সেরা মানের পাটের উৎপাদনকারী। তুলো গাছের বাগান এবং আমের বাগানের বিশাল অঞ্চল দখল করে আমের বাণিজ্য ও রেশম উৎপাদন প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম। মালদার স্বাধীনতা দিবসটি ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে –

"লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।"[২]

তিনি গ্রামীণ লোকনাটক হওয়ার স্বপক্ষে কতকগুলো শর্তের উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে আলোচিত হল।

"১. নায়ক, নায়িকা এবং সকল চরিত্রই গ্রাম নরনারীরই প্রতিনিধি।

২. গ্রামেই সংঘটিত কোন নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা তাদের বিষয়বস্তু।

৩. প্রয়োগ পদ্ধতি বা উপস্থাপনার মধ্যেও কৃত্তিমতা নেই।

৪. কোন সাজসজ্জা নেই, কেবল যেখানে ছেলেরা মেয়ের অংশে অভিনয় করে সেখানে নিতান্ত সাধা ছেলেরা মেয়ে সাজে, আর যখন যার যা পোশাক তাই অভিনয়েরও পোশাক হয়ে থাকে।

৫. তাতে সাজঘর বলে কিছু থাকেনা।

৬. সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারদিকে ঘিরে বসে, যখন যার অভিনয় করার প্রয়োজন, তখন সে সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে, আবার সেখানে গিয়ে বসে।

৭. নাটকের বিষয়বস্তু গ্রামজীবন ভিত্তিক, সেই বৎসর, সেই গ্রামে যেসব প্রণয়মূলক ঘটনা সংঘটিত হয় নাট্য-কাহিনীতে, সংগীতে, সংলাপে ও নৃত্যে তারই রুপায়ন দেখা যায়। সত্যমূলক ঘটনায় তাদের ভিত্তি হয়ে থাকে।

৮. সত্যমূলক ঘটনাকে লক্ষ্য রেখে আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক সংলাপ রচিত হয়।

৯. এদের কাহিনীর সূচনা আছে, ক্রমোন্নয়ন আছে,এবং তার একটি স্পষ্ট পরিণতি আছে।

১০. লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এক বছরের গান কিংবা কাহিনী পরের বছর আর শুনতে পাওয়া যায় না। সেই বছরের জন্য গ্রাম কবিরা সমসাময়িক কিংবা বাৎসরিক নতুন কাহিনীর সন্ধান করেন এবং গ্রাম্য জীবনে তার সন্ধান ব্যর্থ হয় না।

১১. এদের মধ্যে আনুপুর্বিক কোন কাহিনী নেই। কিন্তু কাহিনী ব্যতীত নাটক হয় না।...আনুপুর্বিক ঘটনা নিয়ে তারা রচিত নয়।"[৩]

আবার অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় লোকনাট্যের কতগুলি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন-

"১. গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যে উদ্ভূত, গ্রামীণ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং গ্রামীণ জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত নাটকই লোকনাট্য।

২. লোকনাট্য সংগীত সম্বলিত নৃত্য থেকে উদ্ভূত হয়। সেই কারণে গীত ও নৃত্য এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

৩. লোকনাট্য আঞ্চলিক ভাষাশ্রয়ী, আঞ্চলিক পটভূমি ও ঐতিহ্যের মধ্যে থাকে।

৪. বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক ও গীতিমূলক। মানুষের বিশ্বাস, ত্যাগ ও ভক্তি জাগিয়ে তোলায় এর উদ্দেশ্য।

৫. লোকনাট্যে চারিদিকে দর্শক পরিবেষ্টিত খোলা আসরে অভিনীত হয়। এখানে অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী, অভিনয় সহায়ক কর্মী ও দর্শকমন্ডলী সকলেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। অতিশায়িত অঙ্গ সঞ্চালন, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা এবং আবেগ প্রকাশের প্রবণতা এখানে অপরিহার্য।

৬. মৌখিক ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে লোকনাট্য মুখে মুখে রচিত হয় এবং স্মৃতিবাহক পরম্পরার ধারা এতে রক্ষিত হয়।"[৪]

উপরিলিখিত লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমরা মালদহ জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত গম্ভীরার মধ্যে যে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

মালদহ জেলায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিবকে উদ্দেশ্য করে যে অনুষ্ঠান তাই 'গম্ভীরা' নামে পরিচিত। গম্ভীরা সম্পর্কে প্রথম গবেষক হরিদাস পালিত মহাশয় অবশ্য শিব-মন্দির হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন গম্ভীরা শব্দটি। বর্তমান সময়ের গম্ভীরাপূজা বা উৎসবের গান ও নৃত্যের সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। প্রাচীনকালে তো বটেই আজও গম্ভীরা উৎসবে বা অনুষ্ঠানে পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন –

> "নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য-গণের মধ্যেও গম্ভীরা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্তমানে মালদহ জেলার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, হবিবপুর, রতুয়া, মানিকচক, গাজোল, বামনগোলা ইত্যাদি থানার অন্তর্গত মুখ্য অধিবাসীবৃন্দ হলেন নাগর, বিন্দ, কাহার, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, ছুতার, মাহিষ্য, চাঁই, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রমুখ সমাজের মানুষ বসবাস করেন। গম্ভীরার মুখ্য অংশগ্রহণকারিগণ হলেন নাগর, কেউট, কাহার, গোয়ালা, জেলে, তাঁতি, বিন্দ, ধোপা, নাপিত এবং রাজবংশী। তবে এরমধ্যে রাজবংশীরাই বেশি অংশগ্রহণ করেন।"[৫]

এখনকার সময়ে যেমন গ্রামে গ্রামে, গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান থাকে, তেমনি আগে প্রত্যেক গ্রামে একজন করে প্রধান থাকতেন বা মোড়ল। বিচক্ষণ এই প্রধান লোকটির মতামত সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিত। আর সেই প্রধানকে বলা হতো মন্ডল। প্রত্যেক মন্ডলের কাছে একটা করে গম্ভীরা থাকতো। বর্ণনা পাওয়া যায় –

> "প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মন্ডল থাকলেও সকল জাতির একটি আদিগম্ভীরা ছিল তার নাম 'ছত্রিশী গম্ভীরা' আর এই গম্ভীরার মন্ডল একজনই থাকতো।"[৬]

গম্ভীরার আচারাত্মক অনুষ্ঠান হয় মূলত কোথাও চারদিন, কোথাও বা তিনদিন,আবার কোথাও বা সাতদিন। ঘটভরা, ছোটতামাশা, বড়তামাশা, আহারপূজা অনুষ্ঠিত হতো। এই গম্ভীরা অনুষ্ঠানের একটি অংশ হল গম্ভীরা পালাগান। এই গান শুধুমাত্র মালদা জেলা নয়, বাইরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মোটামুটি পনের-ষোল হাতজায়গা ছেড়ে দর্শকেরা গোল করে বসে। উপরে সামিয়ানা বা অন্য কোন আচ্ছাদন থাকে। একটু দূরে গ্রিনরুম বা সাজঘর থাকে। আসরের একপাশে বসে বাজনাওয়ালা ও গায়কেরা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, বাঁশি ও জুড়ি। আগে শুধুমাত্র ছিল ঢোল ও কাশি। গম্ভীরা পালাগান কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আসরে উপস্থাপিত করা হয়। শিব বন্দনা, ডুয়েট, চারইয়ারি, টনটিং ও রিপোর্ট। এই ভাগগুলির মধ্যে ডুয়েট ও চারইয়ারিতে লোকনাট্যের পরিচয় সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা জানি নাটকের প্রধান চারটি অঙ্গ। কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা সমাবেশ ও সংলাপ। লোকনাট্যের ক্ষেত্রেও তাই। কেবল দৃশ্যপট সেখানে নেই। আর যাত্রার সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকের মধ্যে যে গতি বা অ্যাকশান বর্তমান তার বাহুল্য বীর ও রৌদ্ররসের বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে থাকে আবেগপূর্ণ সুদীর্ঘ সংলাপ। নাটকীয়তায়, রঙ্গ-ব্যাঙ্গে গানের অনুষ্ঠান হৃদয়ের গভীরে পৌঁছায়। লোকসংস্কৃতিবিদ বর্ণনা করেছেন –

> "গম্ভীরা কবিশিল্পীরা নিজেরাই কেবলমাত্র ভাবেন না, সাধারণ আবাল-বৃদ্ধবণিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, গ্রাম্য-শহুরে, ধনী-নির্ধণ সকলকেই ভাবান এবং হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরেন। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য।"[৭]

গম্ভীরা গানের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী চরিত্র থাকে। সাধারণত দুই বা চারজন। দুইজন হলে ডুয়েট এবং চারজন হলে চারইয়ারী। এই পালাবন্দী গম্ভীরা গান ছাড়া অন্য কোথাও চারজন চরিত্র থাকে না। এর মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বা স্পষ্ট বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকাটি গ্রহণ করে দলের সর্বাপেক্ষা দক্ষ অভিনেতা। তার গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ধুতি, কপালে চুনের টিপ, মাথায় ও হাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাধা থাকে, এর অর্থ দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণ। তার বক্তব্য ও রঙ্গ পরিহাসেই গম্ভীর আর নাট্যিক ভাবটি পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে। কাহিনীর মধ্যে গতির সৃষ্টি হয়। দর্শকদের দৃষ্টি সর্বদাই তার দিকেই থাকে। তার সাফল্য বা ব্যর্থতার উপরে নির্ভর করে অনুষ্ঠানের মান। সাধারণত গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তৈরি হয়। গম্ভীরা গান আদি যুগে কেবল গানই ছিল। সেই কারণে লোকসংগীত হিসেবে এইমাত্র গম্ভীর আর মূল্যায়ন নিরূপিত হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চরিত্রদের মধ্যে গানের পাশাপাশি সংলাপও চলে। কখনো বিশিষ্ট কোন চরিত্রের মধ্যে কখনো বা সমবেত কণ্ঠে। সেই কারণে লোকনাট্যের

গুণসম্পন্ন এই গম্ভীরা গান। আদিতে সমাজের বা গ্রামের কোন ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হতো। কারণ সাধারণ গ্রামবাসী সেসমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেত। দূরবর্তী কোনো ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনোই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারেনা। তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা অধিকতর আকর্ষণীয়। এছাড়াও সংসারের সমস্যা, ভাষা সমস্যা, ইংরেজি শিক্ষার কুফল, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি এবং হাল আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশীয়, অন্তর্দেশীয় রাজনীতির কথাও গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুতে লক্ষ্য করা যায়।

গম্ভীরা গান শেষ হয় একটা সর্বজন গ্রাহ্য সমাধানের মধ্যদিয়ে। উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সংলাপ তৈরি করে থাকেন গম্ভীরা শিল্পীরা। দলপতির পরামর্শ মত বা নির্দেশ মত কখনো বা নিজেরা আগেভাগে আলোচনা করে নিয়ে অভিনেতারা গানের আসরে নিজস্ব উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী সংলাপ তৈরি করেন এবং রঙ্গরস পরিবেশন করেন। এতে শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে শিল্পী বিশেষ ব্যঙ্গ-কৌতুকে সুনাম অর্জন করেন, তার নামেই সাধারণত দলের নামকরণ হয়। যেমন ইংরেজবাজারের 'মটর' বা 'মটরার' গান বা 'নিরুর' গান। অথচ গান রচয়িতা হয়তো দেবনাথ রায় ওরফে হাবলা বা গোপীনাথ শেঠ। মটরবাবুর অঙ্গভঙ্গি ও সংলাপের ঢং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সাগ্রহে গ্রহণ করেন বলেই তার অনুষ্ঠানের এত আকর্ষণ। নিম্নে গম্ভীরা পালা গানের ডুয়েট এবং চারিয়ারি পর্বের একটি করে উদাহরণ দেওয়া হল।

ডুয়েট

গোপীনাথ শেঠ, ইংরেজ বাজার, মালদা
(বেকার স্বামী ও চাকুরে স্ত্রীর কলহ)

"স্ত্রী- লাভ ম্যারেজ করে সারা জীবন ধরে
জ্বলে মরলাম হায়!
আস্ফালন তার শোভে কি যার
একটি পয়সার মুরাদ নাই!

১

স্বামী - এ কথা ভাবোনি তখন
বিয়ে করেছিলে যখন,
বাসায় ডাকিয়ে চিঠি পাঠিয়ে (কত) প্রেম নিবেদন তোমার তরে বাপ-মা ছেড়ে আমার এমন দশা হয়!

২

স্ত্রী - হুজুর বলে ডাকবে আমারে
চলবে হুকুম তালিম করে
এদিক ওদিক চললে দিব চাকরি খতম করে
তখন টো টো করে মরবে ঘুরে, খাবে কি বল আখার ছাই।

৩

স্বামী - সরকারের যায় বলিহারি
এ যুগে আমরাই আনাড়ী
পুরুষেতে পায় নাকো কাজ, চাকরি পায় নারী
এরা ছেড়ে হাঁড়ি, দুলিয়ে শাড়ি সব কাজই দখল করতে চায়।

৪

স্ত্রী - শক্তিস্বরূপিনী নারী
ইংলিশ চ্যানেল দিচ্ছে পাড়ি
হাতি নেয় বুকে রেবা রক্ষইতএ দেখ বাহাদুরি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 201 - 214
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই দেশের লাট সাহেব নারী আরও কত প্রমাণ চাই পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু।

৫

স্বামী - আমার মত আছো যারা বেকার
আগে করতে শেখো রোজগার
তারপরে লাভ ম্যারেজ কর নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার স্ত্রীর রোজগারে ভরসা করলে আমার দশা হবে হায়।

৬

স্ত্রী - এতকাল ছিলে উপরে
নামিয়েছে স্বাধীন সরকারে
শাসন গর্জন চলিবে না আর পত্নীর উপরে
ভালো না লাগিলে যাব চ'লে - পতির মোদের অভাব নাই।”[৮]

চারইয়ারি

গোপীনাথ শেঠ, ইংরেজবাজার, মালদা
(কাশ্মীর প্রসঙ্গে)

“১ম-গুলজারিলাল নন্দ (ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব)
২য়-জুলফিকার আলী ভুট্টো (পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী)
৩য়-শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লা (কাশ্মীরের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী)
৪র্থ-ভারতীয় নাগরিক

১

১ম-কাশ্মীরের তরে যুদ্ধ করে ভারত করেছে বহু ক্ষতিস্বীকার
২য়-মুসলিম প্রধান কাশ্মীর রাজ্যে পাকিস্তানের অধিকার
৩য়-ভারত, পাকিস্তান মোদের দুই-ই সমান
৪র্থ-কোন বিচারে বলিস ভারত পাকিস্তান সমান রে ঐ শ্‌ লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দুর নাহি স্থান
দেখ চেয়ে ভারতের প্রতি
মুসলমান উপরাষ্ট্রপতি
মন্ত্রী আর উচ্চ পদে কত
আছে মুসলমান শত শত
বিশ্ব সভায় বক্তৃতা দেয় ভারতপক্ষে মুসলমান
মিস্টার চাগলা ভারত সুসন্তান।
(ধুয়া)ভারতে আছে কজন মুসলমান
চাগলার কত মুসলিম সুসন্তান।
তখন উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. জাকির হোসেন।

২

১ম-পাকিস্তানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানগণে
আজই অতি অসহায়
২য়-কাশ্মীরবাসী মুসলমানগনে
গণ-ভোটই চায়।
৩য়-বুঝেনা কারো অধীন
কাশ্মীর হবে স্বাধীন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 201 - 214
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪র্থ-স্বাধীন কাশ্মীর নিবি বলে আছিস মনের রঙ্গের রে
তাই ঘুসুর মুসুর কাসুর করছিলি চাচার সঙ্গে
যদি কাশ্মীর হয় রে স্বাধীন
স্বাধীনতা রাখবি কদিন
কাঠমোল্লার প্রেমের টানে
গিয়া ভিরবি পাকিস্তানকে
(তখন) আয়ুব খাঁর সুরে সুর মিলায় ধরবি তখন একই তান-
বলবি লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান।

৩

১ম-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঐতিহাসিক সত্যি
কভু হবে না অন্যথা
২য়-মুসলিমগনের হিন্দুস্তানে ঘুচবে না ব্যথা
৩য়-হিন্দু নেতাগণ চায় মুসলিম নিধন
৪র্থ-ভারত সরকার প্রেমিক উদার দিলে তোরে ছেড়ে রে
সাড়ে তিন কোটি টাকা ঢালে চোরের তরে
প্রতিদানে ছাড়িস হুঙ্কার।
স্বাধীন কাশ্মীর চাহিস আবার
সাথে পেয়ে বিভীষণ
জয়প্রকাশ নারায়ণ।
শীঘ্র করে চোরকে ধরে জেলখানাতে দাও চালান
কায়েম রাখো ভারত সংবিধান।”[৯]

আমরা বলতে পারি- মালদা জেলায় দীর্ঘদিন যাবত অনুষ্ঠিত এই লোকসংগীত তার ঐতিহ্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে গম্ভীরা শিল্পীরা একটি নাট্যিকরূপ বজায় রেখেছেন। ড. প্রদ্যুৎ ঘোষ মহাশয় গম্ভীরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-

> “একদা গম্ভীরা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে সেই ধর্ম সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।...তাই গম্ভীরা পালাগান বলা উচিত।”[১০]

গম্ভীরা পালাগানের ডুয়েট এবং চারইয়ারি পর্বের উপস্থাপনে আমরা লোকনাট্যের নানান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। বর্তমান সময়ে যেমন আমরা মালদহের নাট্যদল- মালদা মালঞ্চের অভিনীত নাটক ‘গম্ভীরা গম্ভীরা’ দেখতে পাই।

তিন

দিনাজপুর নামের শাব্দিক অর্থ ‘দিনাজে’র শহর। আবার কারও মতে, মুসলমান অধিকারের যুগে একজন হিন্দু জমিদার নিঃশব্দে ক্ষমতা সঞ্চয় করে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এই হিন্দু জমিদারটি ছিলেন দিনাজপুরের প্রভাবশালী ভূস্বামী রাজা ‘গণেশ’। তিনি ‘দলুজ মর্দনদেব’ নাম ধারণ করেন। ফারসি পণ্ডিতরা ‘দলুজ’ শব্দটি উচ্চারণ করতেন ‘দিনওয়ার’ রূপে। শব্দটি ভাষাতাত্ত্বিক ধারায় ক্রমে আবর্তিত হয়ে ‘দিনওয়াজ’ অর্থাৎ দনুজ>দন-উ-য>দন-ওয়া-য>দন-ওয়া-জ রূপে পরিণত হয়। সতেরো শতকে মুসলিম শাসকরা ‘দিনওয়াজ’ শব্দটি বেছে নেন, যার বাংলা ‘দিনাজ’। তার সঙ্গে ‘পুর’ সহযোগে স্থানটির নামকরণ হয় দিনাজপুর। ঐতিহ্যমন্ডিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ১৯৯২ সালের পয়লা এপ্রিল গঠিত হয়। এই জেলার আটটি থানা এবং দুটি মহকুমা। প্রথমটি বালুরঘাট সদর মহাকুমা আর অপরটি গঙ্গারামপুর মহকুমা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পূর্বদিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র, পশ্চিমে মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা, উত্তর দিকে

বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও উত্তর দিনাজপুর জেলা এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও মালদহ জেলা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আয়তন ২২১৯ বর্গ কিলোমিটার। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, আদিবাসী ও অন্যান্য উপজাতি শ্রেণীর মানুষের বাস এই জেলাতে। আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন এই নদীগুলি জেলার মাটিকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। এই জেলা ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক বিখ্যাত। এই জেলায় অনেক বড় বড় দীঘি রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিপালদীঘি, তপনদিঘী, কালদিঘী, ধলদীঘি, সাগরদিঘী, প্রাণসাগরদিঘী ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে বাণগর, দেবকোটে, আতাসার দরগা, সর্বমঙ্গলার পাথরের দুর্গামূর্তি, কুমারগঞ্জ থানার বটুনে রয়েছে 'সন্ধ্যাকর' নন্দীর জন্মভিটা, গঙ্গারামপুরে পঞ্চরথের মন্দির, পিরপাল গ্রামের বখতিয়ার খলজির সমাধি এবং বিখ্যাত পৌরাণিক শমীবৃক্ষ। রয়েছে বিখ্যাত বোল্লাকালী মন্দির, আত্রাই নদীর পূর্বপারে পতিরামে সুপ্রাচীন বিদ্যেশ্বরী মাতৃস্থান যা পূর্বে 'বিরাট দেশ' নামে পরিচিত ছিল। রয়েছে বিখ্যাত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মিউজিয়াম। গঙ্গারামপুর থানার জাহাঙ্গীরপুর অঞ্চলে বিখ্যাত শ্রীশ্রী বিদ্যেশ্বরী কালী মন্দির।

এই জেলার বিখ্যাত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে গঙ্গারামপুরের তাঁতের শাড়ি, নৌশিল্প, কুশমন্ডি থানা অঞ্চলের মোখাশিল্প, তপনথানা অঞ্চলের শোলাশিল্প, কুমারগঞ্জ ও হিলি থানা অঞ্চলের বিখ্যাত বাঁশ ও বেদ শিল্প। জেলার সদর শহর বালুরঘাটের নাটক পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে গরিমাদীপ্ত। লোকসংস্কৃতিক অঞ্চল হওয়ায় এখানে মনসার গান, গোরক্ষনাথের গান, কানি বিষহরির গান, যুগি, খনগান, কাইঠ্যা নৃত্য ইত্যাদি বিখ্যাত লোকগান। লোকনাট্য মোখানাচ এই জেলার অপর অনন্য যশোগাথা।

গ্রামীণ মানুষের সৃজনশীলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লোকসংগীত। তাই লোক জীবনের উপাদান-উপকরণ লোকসঙ্গীতে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা লোকসংগীতের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে। লোকসংগীত মূলতঃ কোনো না কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মমুখর জীবনের মধ্যদিয়ে গীত হয়ে থাকে। কোন কোন লোকসংগীত আবার নৃত্য নির্ভর। লোকসমাজের বাস্তবতা, ধর্ম, প্রেম, নদী ও কৃষি দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকসংগীতকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত লিখেছেন-

> "আদিমকালের শিকার ও সংগ্রহ পরবর্তীকালের কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনচর্যার উপলক্ষে যত কিছু শ্রম প্রক্রিয়া - সমস্ত মিলেই লোকায়ত জীবনের গানের কাঠামো গড়েছে সুরে তালে। আর সেকাল থেকে এই আমল অবধি গানের কথায় সেই জীবনচর্যার স্বচ্ছ পরিচয়টি উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে অবিরাম গতি প্রবাহে।"[১১]

দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকনাট্য 'খন' নামে পরিচিত। 'খন্ড' শব্দ থেকে 'খন' আসতে পারে যার অর্থ ঘটনা অর্থাৎ লোকসমাজে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাকে নিয়েই 'খন' রচিত। শিশির মজুমদার লিখেছেন-

> "খন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোকসমাজের অতিপ্রিয় এক নাট্যরূপ।"[১২]

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেশিয়া, পোলিয়া লোকসমাজের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, সমাজ জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'খন' রচিত হয়। লোক সমাজের কাছ থেকে জানা যায় এই 'খন' দুই ভাগে বিভক্ত, একটি 'খিসা' অপরটি 'শাস্তোরি'। অবৈধ প্রণয়, খুন, মামলা-মোকদ্দমা, প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয় 'খিসা'। যেমন সতী হ্যাবলা, শিসোসরী উলঙ্গ বাউদিয়া, ঢাকোসরী, মুছিলা মার্ডার, তেভাগা ইত্যাদি। এবং শাস্ত্রীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় 'শাস্তোরি খন'। যেমন নয়ানসরী বোষ্টম বাউদিয়া, বর্মাসরী ইত্যাদি এছাড়াও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক নাটুয়া গানও প্রচলিত। লোকসমাজে একাধিক 'খন' রচিত হয় আবার লুপ্ত হয়ে যায়। তবে যে সব খনের কাহিনী লোকসমাজে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়, তার প্রচলন আজও লোকসমাজে দেখা যায়। যেমন- স্বরূপ সতী হ্যাবলা, তেভাগা, নয়ানসরী বোষ্টম বাউদিয়া ইত্যাদি। ঢাকোসরী, বুলোসরী, মুছিলা, মার্ডার, বর্মাসরী- এগুলি প্রায় লুপ্ত। শুধুমাত্র সমাজে ঘটে যাওয়া বা শাস্ত্রীয় ঘটনায় নয়, জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করেও লোকসমাজের 'খন' গান রচিত হচ্ছে। যেমন এইডস ও পোলিওকে কেন্দ্র করে নতুন 'খন' গান রচিত হচ্ছে।

চার

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রচলিত লোকনাট্য বিষয়ক আলোচনায় দেখা যায় যে দেশিয়া, পোলিয়া লোকসমাজ থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে। মালদহ জেলায় নাগর, বিন্দ, কাহার, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, ছুতার, রাজবংশী লোকসমাজ থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে। লোকনাট্য একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, সমগ্র লোকসমাজই এর স্রষ্ঠা। লোকজীবনকে কেন্দ্র

করে জেলাদ্বয়ের লোকনাট্যের সৃষ্টি হয়েছে। দেশিয়া, পলিয়া সমাজের ভাষায় লোকনাট্যকে 'খন' বলে। লোকজীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'খন' রচিত। এই 'খন' দুই ভাগে বিভক্ত। একটি শাস্ত্র বিষয়ক অপরটি খিসা অর্থাৎ জীবনের নানা ঘটনা বিষয়ক। লোকনাট্য পরিবেশন করার জন্য চাষের জমিতে বা দেবস্থানের জায়গায় কোদাল দিয়ে মাটি কেটে চতুর্দিকে সমান করা হয়। এরপর বাঁশের খুঁটি পুঁতে শামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। মঞ্চের ভেতরে ও বাইরে খড় বিছিয়ে তার উপর ধোকরা বা ত্রিপল দেওয়া হয়। মঞ্চের ভেতরে বাদ্যযন্ত্রীরা গোল হয়ে বসেন এবং তার চারপাশে কুশীলবেরা অভিনয় করেন। মঞ্চের এই সমান্তরাল ভাবধারা থেকে মনে হয় এর মধ্যে আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রভাব রয়েছে।

দুই জেলার লোকসমাজে প্রচলিত লোকনাট্যগুলি বন্দনা গান দিয়ে শুরু হয়। বন্দনা গানের মধ্যদিয়ে সমস্ত দেবদেবীকে স্মরণ করা হয়। এর কারণ হলো লোকনাট্য পরিবেশনকালে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে। এর মধ্যে জাদু ভাবনা ক্রিয়াশীল। এছাড়া লোকনাট্যে মুখোশ ব্যবহৃত হয়, যেমন হালুয়া-হালুয়ানি লোকনাট্যে গরুর মুখোশ, রাম বনবাস লোকনাট্যে রাবণ, হনুমান প্রভৃতি মুখোশ ব্যবহার করার মধ্যে একটা ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা কাজ করে। নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা মুখোশ ব্যবহারে দুষ্ট আত্মা দূরে সরে যায়।

মালদহ জেলায় সাধারণত গম্ভীরা লোকনাট্য বেশ কিছুদিন ধরে চলে। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গম্ভীরা লোকনাট্যের প্রচলন তেমনভাবে নেই। মালদহ জেলার মতো এই জেলাতেও এরা সঙ সাজে, তবে মালদহ জেলা অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে গম্ভীরা লোকনাট্যে। চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে শুরু করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এমন কি আষাঢ় মাস পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের দেখা পাওয়া যায় মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায়। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শুধুমাত্র চৈত্র সংক্রান্তি শুরু থেকে বৈশাখ মাসের মধ্যেই এই লোকনাট্য সীমাবদ্ধ। বছরের এই সময়গুলিতে দুই জেলার মানুষজনই এইসব অনুষ্ঠানে সব কিছু ভুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মেতে ওঠে। প্রতিটি গম্ভীরা মন্ডপে মন্ডপে অন্য সব দেবদেবীর মুখোশ নাচ হয়। সেগুলির মধ্যে রয়েছে কালিকা, 'চামুন্ডা, নরসিংহ, বাসুলি, ঝাঁটা কালী, গৃধিনী বিশাল, মহিষ মর্দনী, রাম, লক্ষণ, হনুমান, বুড়াবুড়ি, শিব, ভুত-প্রেত ইত্যাদি। এই দুই জেলাতেই দেখা যায় দেবদেবীর মুখোশের নাচের বাজনার তাল আলাদা আলাদা। নাচের ভঙ্গি হলো প্রথম দিকে মন্ডপের বা মন্দিরের হর-পার্বতীকে প্রণাম করে মুখোশটি বাঁধতে হয়। মুখোশটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই নাচ শুরু করে দেন শিল্পীরা। বাজনার তালে তালে ধীরে ধীরে নাচতে নাচতে আবার দৌড়ে মন্দিরের সামনে যায় এবং মন্দিরের পুরোহিত যিনি থাকেন তিনি ফুল ও ধূপ দেখিয়ে আশীর্বাদ করেন। তারপর আবার নাচ শুরু হয়। সবচেয়ে ভয়ংকর নাচ হচ্ছে-নরসিংহ নাচ। এই নাচের সময় সবাই সতর্ক থাকেন কারন এই নাচের সময় শিল্পী দৌড়ে চলে যায় একদিক থেকে অন্যদিকে। ঢাকিয়ার বাজনার তালে তালে এবং মন্ডপের ধুপ-ধুনার সুগন্ধে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ভক্তরা নাচ করে। দর্শকদের মধ্যে এক ভয়ের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সবাই ভিড় জমিয়ে ঠেলাঠেলি শুরু করে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে আনন্দ উপভোগ করেন। নাচতে নাচতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় মশানগড়ার নৃত্য শেষ হলে সমস্ত মুখোশগুলি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। এরপর শুরু হয় 'আহারা' পূজা। এই পূজোর পরই শুরু হয় বিভিন্ন পথনাটক। এই পথনাটকগুলি মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই পথনাটক খুব একটা চোখে পড়ে না। শুধুমাত্র নাচ, গান-বাজনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বিষয়গত দিক থেকে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জেলাদ্বয়ের লোকনাট্য উপস্থাপনাগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন নাটক শুরুর আগেই বন্দনা গান। এরপরেই শুরু হয় নাটক। বর্তমানে এই লোকনাট্য শিল্পীদের ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন এই সমাজ। বিশেষত গ্রামে-গঞ্জে কাজের খোঁজে সবাই ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই এই সমস্ত শিল্পীরা অন্য পথ বেছে নিচ্ছেন। কারণ এই সমস্ত কাজ যারা করেন তারা সবাই নিম্নবর্গীয়। ফলে এই লোকশিল্প ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। তাই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শিল্পীদের অর্থনৈতিক দিকটা সরকারের ভেবে দেখা দরকার। আর সেটা যদি না করা যায় তাহলে এই শিল্প ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

পাঁচ

গম্ভীরা লোকগীতি ও লোকনাট্যগুণ সম্পন্ন। অধিকাংশ লোকগীতি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উৎসজাত। ধর্ম বিশ্বাস লোকজীবনের গভীরে নিহিত। এই ধর্মবিশ্বাস দৈবশক্তির বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ, নিরাপদ করবার ক্ষমতা আছে কেবল ঈশ্বরের - এই বিশ্বাসেই দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য পূজার্চনা, দান, নাচ, গান ইত্যাদি করা হয়। যেহেতু লোকজীবন মুখ্যত কৃষিনির্ভর সেহেতু লোকঅনুষ্ঠানে কৃষিবৃত্তি সংক্রান্ত নাচ-গানই বেশি। সেই কারণে গম্ভীরাও মূলতঃ কৃষিভিত্তিক গান। দক্ষিণ দিনাজপুরে গম্ভীরা লোকনাট্য সেইরকম ভাবে প্রচলিত নেই। এখানে ‘খন’ লোকনাট্যের বেশি প্রাধান্য। ‘খন’ গানে গম্ভীরা গানের মত মূলপালা ছাড়াও ছোটগান পরিবেশন করার রীতি দেখা যায়। ছুট গানগুলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত হয়। জোকার বা বিদূষকসহ ছেকরার নাচের মাধ্যমে অল্পসময়ে পালাবহির্ভূত বিষয় উপস্থাপিত করা হয়। আসলে লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে লোকসমাজের নানা সামাজিক সমস্যা ও ঘটনা এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় - এই সমস্ত লোকনাট্যের মধ্যে। এই ছুট গানগুলি সাধারণত নাট্যমুক্তি রূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আসলে এই শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সবাই নিম্নমধ্যবিত্ত। তারা কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় আবার ঠিক যখন অনুষ্ঠান শুরু হয় তার আগেই নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। আসলে এই নিম্নবিত্ত মানুষগুলো আছে জন্যই এই শিল্প এখনো টিকে আছে। বর্তমানে দেখা যায় এই লোকসংস্কৃতিগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে যেতে চলেছে। তাই সরকার যদি এই শিল্পীদের উপযুক্ত সাম্মানিক দিয়ে তাদের কর্মকে উৎসাহিত করেন তাহলে এই শিল্প কখনোই অবলুপ্তির পথে যাবে না।

দুই জেলার সামাজিক লোকনাট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে অবৈধ প্রেম। এই অবৈধ প্রেম সমাজ মেনে নেয় না, তার পরিচয় লোকনাট্যগুলোতে পাওয়া যায়। এই লোকনাট্য থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অবৈধ প্রেম সমাজ স্বীকৃত নয়। লোকসমাজে কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় করে, তাহলে তার শাস্তি যে অনিবার্য সেটি লোকনাটকে দেখানো হয়। লোকসংস্কৃতিবিদ মানস মজুমদারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে-

> “লোকনাট্যের মূল উদ্দেশ্য নাট্যরস পরিবেশন ও দর্শক মনোরঞ্জন। কিন্তু তাই সব নয়। লোকনাট্য লোকশিক্ষার এক বড় মাধ্যম। লোকসমাজ লোকনাট্য থেকে নানাভাবে শিক্ষা পেয়ে থাকে।”[১৩]

লোকসমাজে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা থেকে লোকশিক্ষার জন্ম হয়েছে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ও লোকশিল্পীরা হলেন এই লোকশিক্ষার শিক্ষক। এই লোকশিক্ষকেরা দুটি জেলার লোকসমাজে লোককথা, লোকনাট্য, লোকসংগীত, ধাঁধা, প্রবাদ, লৌকিক ছড়া ইত্যাদি লোকসাহিত্যের নানা উপাদানের মাধ্যমে পরম্পরাক্রমে উত্তর পুরুষদের লোকায়ত শিক্ষাদান করেন। লোকসাহিত্যের এই নানান শাখার মধ্যদিয়ে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তার ব্যাখ্যাও লোকশিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো বা মন্দের স্বরূপ বুঝতে পারেন এবং নিজেদের সংশোধন করার পথ তারা পেয়ে যান। সংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দিক থেকে এর মূল্য অনেক। তাই এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার তুলনায় প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা কোন অংশে কম নয়। তাই জেলা দুটি লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই লোকশিক্ষা তাৎপর্যবাহী ভূমিকা গ্রহণ করে।

Reference:

১. চৌধুরী, দুলাল, ‘পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্য : একটি সমীক্ষা’, মধুপর্ণী (পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা), সম্পাদক- অজিতেশ ভট্টাচার্য,পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১৩৯৯, শিবতলি, বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর, পৃ. ৪৩৫

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘বাংলার লোকসংস্কৃতি’, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ১১০০১৬, পৃ. ১২৯

৩. মিত্র, শ্রীসনৎকুমার, (সম্পাদিত) ‘বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ২

৪. তদেব পৃ. ১৬

৫. তদেব পৃ. ২৭

৬. তদেব পৃ. ৬২

৭. ঘোষ, ড. প্রদ্যুৎ, ‘লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- নববর্ষ ১৪১০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৮৬

৮. তদেব পৃ. ১৭৮

৯. তদেব পৃ. ১৭৯-১৮১

১০. মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (সম্পাদিত), ‘বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৬৩

১১. সেনগুপ্ত, পল্লব, ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ. ৯

১২. মজুমদার, শিশির, ‘লোকনাট্য-নাটক কথা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার ২০০৫, পৃ. ৯৫

১৩. মজুমদার, মানস, ‘লোকসাহিত্য-পাঠ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- অগ্রাহায়ন ১৪০৬, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৪৪

Bibliography:

ঘোষ, ড. প্রদ্যুৎ, ‘লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- নববর্ষ ১৪১০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ‘লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৩,

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘বাংলার লোকসংস্কৃতি’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ১১০০১৬, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭,

মজুমদার, শিশির, ‘লোকনাট্য-নাটক কথা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার, ২০০৫

মজুমদার, মানস, ‘লোকসাহিত্য-পাঠ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- অগ্রাহায়ন ১৪০৬, নভেম্বর ১৯৯৯

মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (সম্পাদিত), ‘বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০০০

সেনগুপ্ত, পল্লব, ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২

সরকার, পবিত্র, ‘লোক ভাষা ও লোকসংস্কৃতি’, চিরায়ত প্রকাশনা, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০৩, বৈশাখ, ১৪১০

সুর, অতুল, ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ, ১৩৯৫, জুলাই, ১৯৮৮